মানব উন্নয়নে অন্য ভাবনা

প্রবন্ধ সংকলন

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

লেখকের কথা	
মুখবন্ধ	
গল্প হলেও সত্যি	১৯
দেশবাসীর অপুষ্টি	২৪
গুলগুলিয়া	২৭
ডিম খাওয়া না-খাওয়া নিয়ে ধন্দে	২৯
শিশুদের ভবিষ্যৎ তো আমাদের ভবিষ্যৎ	৩৩
আমরা কি চাই - জীবন না মৃত্যু	৩৭
ম্যালেরিয়া এখনও নির্মূল হয়নি	৩৯
নির্মলচরের বন্যার্তদের পাশে	৪৭
লেখাপড়া শিখে কী হবে	৫১
কেন এই তাচ্ছিল্য	৫৭
মেয়েদের ক্ষমতায়ণে শিক্ষা	৫৯
এই আলোয় এই ছায়া	৬২
এমনি করেই ...	৬৩
দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ণের উপায় সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ	৬৭
উন্নয়ণে গণ অংশদারিত্ব : একটি বিকল্প ভাবনা	৭১
উন্নয়ন কী ভেবে ও কী ভাবে	৭৫
যা দেখেছি যা বুঝেছি	৮০
অন্য ভুবন, লেখকের সঙ্গে ডা. কৌশিক দাসের আলাপচারিতা	৮৬
Journey of Dr.. Siddhartha Mukherjee	১০২

মুখবন্ধ

এক অপার বিপন্ন বিস্ময় এই বইয়ের লেখক, এবং আমার বন্ধু সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে; নাম নয়, যশ নয়, স্বচ্ছলতা নয়। আমাদের সমাজে যে সব পরিচিত মাপকাঠি দিয়ে আমরা সাফল্যকে ওজন করতে অভ্যস্ত, সেগুলিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে পাশ কাটিয়ে সে আপন লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল। তাই যেদিন দূরভাষে অনুরোধ এলো তাঁর বইয়ের এক 'মুখবন্ধ' লিখে দেওয়ার জন্য, তখন আমার অবাক হওয়াটা ছিল খাঁটি। নিজেদের ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে স্বার্থমগ্ন মানুষের যাকে চলতি কথায় 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' বলে, তেমন কুকথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সিদ্ধার্থ সমাজ নিয়ে ভাবেন, সমাজের অবহেলিত মানুষদের ভালোবেসে তাদের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করেন। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের মতো মনে হতে পারে হতভাগ্য দেশের বিপুল সংখ্যক গাঁ-গঞ্জের মানুষদের সংখ্যা মনে করলে, কিন্তু তার মুষ্টি ছাড়া হলেও সুবর্ণের মুষ্টি।

তার পর একদিন সশরীরে আমার বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে লেখার পাণ্ডুলিপির ফাইল। পড়ে ফেললাম। তার পর ভাবলাম যাঁর লেখার উৎস এতই আন্তরিক, তার বইয়ের আবার কিসের পরিচায়িকা? আমার সে যোগ্যতাই বা কোথায়! দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবন শেষ করে অবসর নিয়েও অবসর নেই আমারও, তবু সানন্দে রাজী হতে হ'ল। সিদ্ধার্থর অনুরোধ মানব না এমন সাধ্য কোথায়?

সিদ্ধার্থ ডাক্তার। আমি যতদিন তাঁকে দেখছি, কোনোদিন এটিকে পেশা বা অর্থ উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে দেখিনি । বয়সে আমার প্রায় সমসাময়িক, সিদ্ধার্থ হয়তো দু'এক বছরের বড়োই হবে। ১৯৬৮তে সে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এবং ১৯৭১-এ বিলেত চলে যায়। আমিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের

শিক্ষা নিয়ে স্বেচ্ছায় ১৯৭১ থেকেই পড়ানোই বেছে নিই। সিদ্ধার্থ বিলেতে রয়্যাল কলেজ অফ অ্যানেসথেসিয়া-য় ফেলোশিপ অর্জন করে ইংল্যান্ড এবং আয়ার্ল্যান্ড থেকে। তার পর, যতদূর জানি, দীর্ঘ সময় কাটায় চিকিৎসার কাজে ইংল্যান্ডে, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে। কিন্তু তার মন পরে ছিল এই বাংলার ভূমিতে, যেখানে তার মতো অজস্র ভিটে মাটি ছেড়ে আসা পূর্ব-বাংলার মানুষ জীবন সংগ্রামে রত; যেখানে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামবাসী, শ্রমিক-কৃষক, অশিক্ষা আর কর্মহীনতায় জর্জরিত, বিনা চিকিৎসার শিকার; যেখানে বিদ্যালয় ছুট বা ড্রপ আউট তো দূরস্থান বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারই পায় না নিম্নশ্রেণির কত ছেলেমেয়ে; শরীরের রুগ্নতা, অনাহার-অর্ধাহার আর অপুষ্টি যাদের চিরসাথী। তাই দেশে ফিরে ডাক্তারিকে অর্থকরী পেশা হিসেবে বর্জন করলেন। শুরু হ'ল নতুন জীবন।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ গত শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি। 'কালান্তর' পত্রিকার দপ্তরে। অচিরেই ঘনিষ্টতা এবং সখ্য। এক দশকেরও বেশি আমরা দক্ষিণ শহরতলির গড়িয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রায় প্রতিবেশী অথচ সেখানে, নাকতলায়, দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সিদ্ধার্থকে আমি নাম ধরে না ডেকে 'ডাক্তারবাবু' নামে সম্বোধন করি। দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে নানা মিটিংএ প্রায়ই দেখা হয়, মুগ্ধ হই তার সহজ সরল ব্যবহারে। পোশাক -আশাক বরাবরই সাদামাটা। সহজেই মিশে যেতে পারেন জনতার মধ্যে।

গত শতকের আশির দশক থেকেই হাতে কলমে জনগণের মধ্যে কাজ করার সূচনা। কখনও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা, কখনও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির তৈরিতে সক্রিয়তা, কখনও উদ্বাস্তু আন্দোলনে অংশীদার। অন্য দিকে শান্তি আন্দোলনেও তিনি আছেন, যেমন আছেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মঞ্চে। কখনও গড়ে তুলেছেন অংসগঠিত শ্রমিকদের নিজস্ব সমবায়, শহরে। অন্য দিকে গ্রামে ছড়াতে চেষ্টা করেছেন শিক্ষার আলো, সাহায্য করেছেন বিদ্যালয়ে পাঠ্যবইয়ের গ্রন্থাগার নির্মাণে। সব কিছুতেই উদ্দেশ্য অবহেলিতদের ক্ষমতায়ণ। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরতা বাড়ানো। কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন বীরভূম, বাঁকুড়া আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা। আয়লার পর ছুটে যান সুন্দরবনে, বন্যার পর মুর্শিদাবাদে।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং মার্ক্স দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধার্থর চিত্ত ভয়শূন্য, শির উচ্চ। সকলের জন্য আরও সুন্দর হোক ভবিষ্যৎ, এই তার কামনা।

সিদ্ধার্থ সবচেয়ে সক্রিয় জনস্বাস্থ্য নিয়ে। স্বাভাবিক। আসলে সার্বিক স্বাস্থ্য মানেই তো— শিক্ষা সচেতনতা, আত্মনির্ভরতার সঙ্গে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা, অনাহার থেকে মুক্তি, সামাজিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন। এ কাজে তার 'পুষ্টি' নামক সংস্থা স্থাপন, বিদ্যালয়ে মিড-ডে -মিল চালুর জন্য সক্রিয়তা, ছাত্রছাত্রীদের ডিম সেদ্ধ খাওয়ানো। এই সব কাজে পেয়ে যান কিছু শুভানুধ্যায়ীকেও। বাড়তে থাকে বীরভূমের সাজিনা বা দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির গোপালগঞ্জের কাজ।

সদাব্যস্ত সিদ্ধার্থ এ সবের পাশাপাশি কখনও কখনও কলম ধরেন। যে সব প্রকাশিত হয় নানা পত্র পত্রিকায়। 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রতি সোমবারের 'প্রকৃতি ও মানুষ' বিভাগে তার অনেক লেখা আমি পড়েছি। অন্যত্র পড়েছি। আর এই যে বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে তাতেও লেখক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়কে নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

'গল্প হলেও সত্যি' তার নিজের অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো কথা অথচ আমার বিবেচনায় তা সমাজ বাস্তবতার দলিল। 'দেশবাসীর অপুষ্টি' রচনায় এমন এক সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে যার আজও সমাধান বাকি। 'লেখাপড়া শিখে কী হবে?' এর উত্তর সমাজ পরিবর্তন কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয়? প্রশ্ন আমাদেরও। 'গুলগুলিয়া' বা 'শিশুদের ভবিষ্যৎ তো আমাদেরই ভবিষ্যৎ' অথবা 'কেন এই তাচ্ছিল্য' লেখকের অভিজ্ঞতা প্রসূত ভাবনা যা আমাদেরও ভাবায়। একই কথা প্রযোজ্য 'মেয়েদের ক্ষমতায়ণে শিক্ষা' রচনাটি সম্পর্কেও। লেখক যে মহিলাদের ক্ষমতায়ণ নিয়ে বিশেষ ভাবে ভাবনা-চিন্তা করেন তা বোঝা যায় তাঁর 'দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ণের উপায় সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ' লেখাটি পাঠ করলে।

যেহেতু লেখক সক্রিয় সমাজকর্মী তাই তাঁর নানা রচনাতেই ঘুরে ফিরে আসে অভিজ্ঞতার কথা, নিজস্ব প্রত্যয়ের কথাও। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'নির্মল চরের বন্যার্তদের পাশে' বা 'ডিম খাওয়া না-খাওয়া নিয়ে ধন্দে' রচনা দু'টির কথা বলতে চাই। সামাজিক উন্নয়নই লেখকের ধ্যান-জ্ঞান। তা নিয়ে লেখা থাকবে না, তা কি হয়? অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে তিনি সংযুক্ত করেছেন দু'টি

রচনা, যাদের শিরোনাম যথাক্রমে 'উন্নয়ন কী ভেবে ও কী ভাবে' এবং 'উন্নয়ণে গণ-অংশিদারিত্ব : একটি বিকল্প ভাবনা'। শেষ করেছেন 'যা দেখেছি যা বুঝেছি' শীর্ষাঙ্কিত, এক বামপন্থী সমাজকর্মীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত আত্মসমীক্ষা-র মধ্য দিয়ে।

তবে, শেষেরও শেষ থেকে। বর্তমান বইটিতে যুক্ত হয়েছে সিদ্ধার্থর দু'টি কবিতা। কৌতূহলের সঙ্গে পড়লাম আর সুশোভন ভাবে সংযুক্ত 'অন্য ভূবন' শিরোনামে ডা. কৌশিক দাসের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাতের বিবরণ এবং সোমনাথ মুখার্জির কলমে লেখকের কাজের পরিচায়ক একটি ইংরিজি রচনা। পাঠক-পাঠিকারা শেষোক্ত লেখাটিতে আমাদের সমাজে ব্যতিক্রমী লেখককে সামনাসামনি দেখতে পাবেন। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৪ই জুলাই, ২০১৪ গৌতম নিয়োগী

গল্প হলেও সত্যি

দিন বদলের পালায় কে ধরিবে হাল

১

কয়েক দশক আগের কথা। শিলিগুড়িতে মামাতো ভাই-এর বাড়িতে সাময়িক ভাবে আস্তানা নিয়েছি। সে সময় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে আমার পোস্টিং হয়েছিল। বর্ষাকাল। ভোর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। ওই বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির কাজের মহিলা সময়মতো এসেছিল। মামাতো ভাই-এর কাছ থেকে সে জানতে পারে আমি একজন ডাক্তার। তাই সে আমাকে অনুরোধ করে আমি যদি একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বামীকে দেখে আসি। সে বেশ অসুস্থ। আমি তাঁকে বলি, বৃষ্টিটা থামুক, তার পর না-হয় তোমার স্বামীকে দেখতে যাওয়া যাবে। আমার কথা শুনে তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তর— সে নিজে যদি এই বৃষ্টিতে কাজে আসতে পারে তবে তুমি-বা যেতে পারবে না কেন? কথাটা যথার্থ মনে করে তাঁর কথা মতো বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর স্বামীকে দেখতে ওঁদের বস্তিতে গিয়েছিলাম। এই অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান— "সবার জন্য স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের জন্য সবাই"। তবে এর জন্য চাই শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য অধিকারের চেতনা।

২

প্রায় দেড় দশক আগে আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীকে এক আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কথোপকথনের সময় তিনি একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি পুরুলিয়ার আদিবাসী অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সে সময় গ্রামের এক বৃদ্ধা তাঁকে বলেছিলেন "বাবা, তুমি আমাদের বাড়িতে আলো

না দিয়ে বরং পথে আলোর ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সারাদিন গা-গতরে খেটে নেশা করে বাড়ি ফেরে। তার পর খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়িতে ওদের আলোর দরকার কি? কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরার পথে প্রায়শই ওদের মধ্যে কাউকে না কাউকে সাপে কাটে। তাই বলছিলাম, আমাদের ঘরে আলো না দিয়ে বরং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করলে ওরা প্রাণে বাঁচে।" কিন্তু প্রশ্ন জাগে বাড়িতেও আলো না থাকলে শিশুশিক্ষার কি হবে?

৩

সুন্দরবনের ছোট্ট একটি দ্বীপ। যার কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে বিশাল ঠাকুরণ নদী। ওই দ্বীপের একটি গ্রাম শ্রীপতিনগর। এক সময় আমার ভাইপো সমাজসেবার কাজে ওই গ্রামে গিয়েছিল। একদিন গ্রামে চলার পথে দেখে একটা পুকুরঘাটে আট-নয় বছরের একটি মেয়ে তারস্বরে কাঁদছে। আর তার মা মেয়েটির হাতটা পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখেছে। আমার ভাইপো কাছে গিয়ে মেয়েটির মাকে জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে? মেয়েটি ওভাবে কাঁদছে কেন? উত্তরে মেয়েটির মা জানায় ওর হাতে মাছে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে। আমার ভাইপো বলে আপনি তাড়াতাড়ি গ্রামের একজন ডাক্তারকে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসুন। ততক্ষণে সে তাঁর মেয়েকে ওর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি যাওয়ার পথে মেয়েটি যন্ত্রণায় কেঁদেই চলেছে। ওদের বাড়িতে পৌঁছোনোর পর বাড়ির দাওয়ার কাছে এসে মেয়েটি ওই যন্ত্রনার মধ্যে মুহূর্তের জন্য কান্না থামিয়ে বাড়ির লোককে ডেকে বলে (অতিথিকে বসাবার জন্যে) "একটা পাটি এনে দে।" মনে হলো আজ এ ধরনের আতিথেয়তা পাওয়ার জন্য খুঁজতে হবে "কোথায় পাব তারে"।

৪

বেশিদিন আগের কথা নয়, বীরভূমের সাজিনা গ্রামে চেনা এক আদিবাসী মহিলার বাড়িতে গল্প করতে গিয়েছিলাম। দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ওঁর সংসার। অনেককাল আগেই ওঁর স্বামী ওঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। সংসার সামলাতে গা-গতরে খেটে ওঁকে রোজগার করতে হয়। জিজ্ঞেস

করেছিলাম— ওঁরা সারাদিনে কী খায়? উত্তরে জানিয়েছিল, সকালে মুড়ি আর দুপুরে ও রাতে ভাতের সঙ্গে যৎসামান্য তেলে আলুর তরকারি, আর মাঝেমধ্যে সবজি। মাছ-ডিম খায় কি-না জানতে চাওয়া হলে বলেছিল সপ্তাহে একদিন কুঁচো মাছ খায় যে দিন পুকুরে বা খালে ধরতে পারে। একশ দিনের কাজে বা ধান রোওয়ায় বা ধান কাটার কাজে যা আয় তাতে তো প্রোটিন জাতীয় খাবার পাতে না-পড়ার কারণ নেই। উত্তরে বলেছিল তাঁকে তো টাকা জমিয়ে রাখতে হয়। কারণ রোজ তো কাজ জোটে না। আর গ্রীষ্মে তো পুরো মাসটাই বসে কাটাতে হয়। এর পরও আছে অসুখ-বিসুখ। অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও ওষুধের খরচ সামলে সংসার চালাতে হয়। এখন না-জমালে তখন টাকা পাবে কোথা থেকে? আমি বললাম একটু ভালো খাবার না-খেলে তুমি ও তোমার মেয়ে রুগ্ন হয়ে পড়বে। এতে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই পরামর্শ দিয়েছিলাম তার চেয়ে বরং সপ্তাহে আধখানা করে ডিম এবং বাকি তিনদিন কিছুটা পরিমাণে সোয়াবিন আর তিল বাটা দিয়ে তরকারি খেলে, শরীর কিছুটা হলেও প্রথম শ্রেণির প্রোটিন ও তেল পাবে। এতে শরীরটা সবল থাকবে। পরামর্শ মেনেছিল কি-না জানি না। তবে মনে হয়েছিল জীবনের এ অনিশ্চয়তাকে কে বা কারা দূর করবে? 'বাজার' কি নিশ্চয়তার হাত বাড়িয়ে দেবে এ রকম লক্ষ-কোটি দিনমজুরের জীবনে? না কি অন্য কোনও পথে এর সুরাহা হবে?

৫

তা বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ইন্টারনেট থেকে 'মিট প্রসেসিং' নামে একটা ভিডিও নিজের কমপিউটারে এসে গেল। সেখানে দেখানো হয়েছে কী ভাবে ধাপে ধাপে পশু-পাখিদের জন্ম থেকে বড়ো করা হয় মানুষের পাতে মাংসের সুস্বাদু খাবার পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে। এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নির্বিকারচিত্তে নির্দয় ভাবে কাজ করে চলেছেন। এখানে সে দৃশ্য বর্ণনা করা শ্রেয় নয় বলেই বোধ করেছি। এ ছবিটা লেখকের তিরিশ সেকেণ্ড বসে দেখা সম্ভব হয়নি। কারণ এর নির্মম দৃশ্য।

আমাদের শহরে রিক্সা-ভ্যান বা সাইকেলে মুরগিগুলিকে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের মাংস খাওয়ার তৃপ্তি মেটাতে। এ দৃশ্য

দেখতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত ও নির্লিপ্ত যে পরমুহূর্তে মাংসের দোকানে এসে দাঁড়াই, যেখানে মুরগিগুলিকে জবাই করা হবে আমাদের সামনেই। আর পলকহীন দৃষ্টিতে শিহরণহীন চিত্তে আকুল আগ্রহে সে দৃশ্য আমরা উপভোগ করব। কেবলমাত্র শরীরের প্রয়োজনে নয় বরং আমাদের লালসার স্বাদ মেটাতেই আমরা উদগ্রীব বেশি। আমাদের সন্তানরা এই পরিমণ্ডলে বড়ো হয়। এর ফলস্বরূপ প্রায়শই শুনতে হয় "আমার ছেলেটার রোজ চিকেন না হলে চলেই না।"

পশু-পাখির ওপর নিষ্ঠুরতা নিয়ে বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আলাপচারিতায় ওর স্বাভাবিক উত্তর "I am not an animal lover, I am an animal-meat lover". লেখকও এ ভাবনার ব্যতিক্রম ছিল না। এর জন্য তাঁর মন প্রতিনিয়ত পীড়িত হয়। উন্নত দুনিয়ায় লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাবে মাংস তৈরির প্রক্রিয়াকরণ হয় সে দৃশ্য দেখলে শিউড়ে উঠতে হয়। এই 'সভ্যতা' আজ বিশ্ব - পরিসর গ্রাস করেছে। এর মহিমায় আমরা উল্লসিত, উদ্দীপিত, লালশার আনন্দে আত্মহারা। এই লোভের ক্ষুধা কে মেটাতে পারে?

৬

মধ্যভারত, মালভূমি অঞ্চল। আমার পিতৃদেবের কর্মসূত্রে ওই অঞ্চলে আমার শৈশব কেটেছে। সেই স্মৃতির রেশ ধরে বেশ কয়েক দশক পর ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল ছত্তিশগড় রাজ্যে। বিলাসপুর ষ্টেশন থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে 'জনস্বাস্থ্য সহযোগ' সংস্থার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটি হাসপাতাল। এ ছাড়াও দূর-দূরান্তের একশটি গ্রামে তৈরি হয়েছে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ওই সব মহিলাদের সংস্থার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ও সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি, বিশেষ করে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার। এতে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই বেশি। 'জনস্বাস্থ্য সহযোগ' সংস্থার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি সমীক্ষা করে— ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে। যে সব পরিবারে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে মৃত্যুর কারণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। ওদের হাসপাতালে একটি আলোচনা সভায় প্রতিটি মৃত্যুর কাহিনি শোনানো

হয়েছিল। সেখানে যে সব মর্মান্তিক ঘটনা বিবৃত হয়েছিল তা শুনে শিউড়ে উঠেছিলাম। সে রকম একটি ঘটনা — গ্রামের একটি ছোটো পরিবার। স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের একমাত্র দশ বছরের ছেলে। তাঁদের ছেলেটি জ্বরে আক্রান্ত এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তাঁদের গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে। সেখানে ডাক্তার দেখার পর রুগি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এমন নির্ণয় করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয় শহরের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। শহরে যাওয়ার পরিবহন বন্ধ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স নেই। এবং ছেলেটির দ্রুত চিকিৎসা যে খুব জরুরি সে বিষয়েও অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয় না। এ দিকে ছেলেটির বাবা-মার কাছে বেশি টাকা না থাকায় বেশি দামে গাড়ি ভাড়া করে শহরের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ তাঁদের ছিল না। অগত্যা ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে তাঁরা বাধ্য হন এবং মনস্থির করেন গ্রামে গিয়ে কিছু টাকা জোগার করে খুব ভোরে গাড়ি ভাড়া করে শহরের হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে যাবেন। দুর্ভাগ্য সেই রাতেই ছেলেটি মারা যায়। এখানে জানানো দরকার পরিবার-পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীদের পরামর্শে ও উদ্যোগে ছেলেটির বাবার নিবীর্যকরণ করা হয়েছিল। ফলে পরবর্তীকালে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা তাঁদের নেই বললেই চলে। উদ্যোক্তারা সমীক্ষা থেকে জানতে পারে ওই অঞ্চলে প্রায় দু'শজন ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছে। যদিও ওই রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী সারা রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা মোটে 'পঞ্চাশ'!

যেটা জোর দিয়ে বলা দরকার — স্বাধীনতার পর যাদের উন্নত জীবনযাপন পাওয়ার কথা ছিল তাঁরা পেল না। তাঁদের জন্য যে সব রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মাঠে-ময়দানে নামার দরকার ছিল তাঁরা নামল না। তাঁরা শুধুই কথা বলল আর ভোট কুড়োনোর চেষ্টা করল। তাই শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা ও তাঁদের সন্তানরা না-পেল পুষ্টি, না-পেল শিক্ষা, না-পেল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ সব অধিকারের জন্য শ্রমজীবীদের আরও অনেকটা পথ পেরোতে হবে সংগ্রামের শপথ নিয়ে, যতদিন-না তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।